আগুনের পরশমণি ও কয়েকটি ঘটনা

মৌ সন্ধ্যা

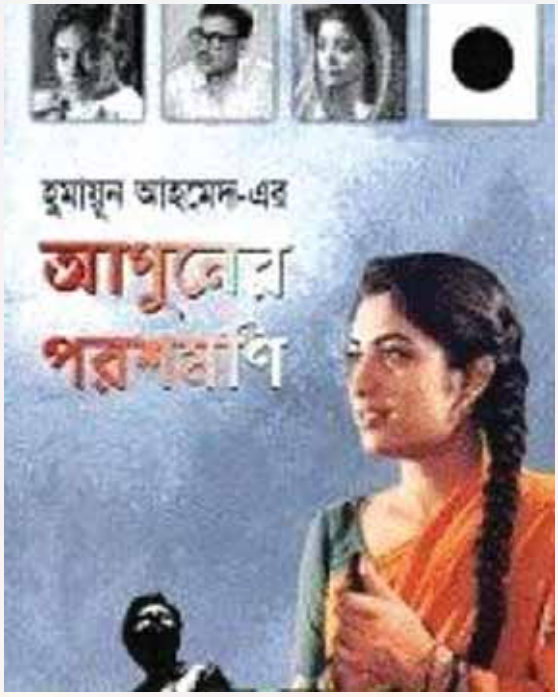

মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা নিয়ে যেকটি সিনেমা নির্মাণ হয়েছে তার মধ্যে আলোচিত একটি সিনেমা 'আগুনের পরশমণি'। ১৯৮৬ সালে অন্যপ্রকাশ থেকে প্রকাশিত হয় প্রখ্যাত সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের 'আগুনের পরশমণি' উপন্যাসটি। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালে ঔপন্যাসিক নিজেই এই উপন্যাস অবলম্বনে একই শিরোনামে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। রঙবেরঙ-এর মুক্তিযুদ্ধের সিনেমা নিয়ে নিয়মিত আয়োজনের এ পর্বে আমরা আলো ফেলার চেষ্টা করবো 'আগুনের পরশমণি' সিনেমায়।

মুক্তির আলোয় 'আগুনের পরশমণি'

একসময় নাট্যকার ও নাটক নির্মাতা হিসেবে তুমুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন হুমায়ূন আহমেদ। এরপর তিনি সিনেমা নির্মাণ করেন। ১৯৯৪ সালে মুক্তি পায় 'আগুনের পরশমণি' সিনেমাটি। প্রথম সিনেমা বানানোর জন্য লেখক বেছে নিয়েছিলেন নিজেরই লেখা 'আগুনের পরশমণি' উপন্যাসটি। এতে অভিনয় করেছেন বিপাশা হায়াত, আসাদুজ্জামান নূর, আবুল হায়াত, ডলি জহুরসহ আরো অনেকে। সিনেমা নির্মাণের শুরুতে অনেকেই কটূ কথা শুনিয়েছেন হুমায়ূনকে। কিন্তু সিনেমা বানিয়েও ইতিহাস গড়েছেন সবার প্রিয় এই লেখক। ১২৩ মিনিট দৈর্ঘ্যের এই সিনেমাটির প্রযোজক ছিলেন হুমায়ূন আহমেদ নিজেই। চিত্রগ্রাহক ছিলেন আখতার হোসেন। সম্পাদনায় ছিলেন আতিকুর রহমান মল্লিক। আর পরিবেশক নুহাশ চলচ্চিত্র।

কী আছে 'আগুনের পরশমণি' সিনেমায়?

এই সিনেমায় দেখা যায় একটা সময়কে। যে সময়ের মধ্যদিয়ে আমরা পেয়েছি বাংলাদেশ। ১৯৭১ সালের মে মাস। অবরুদ্ধ ঢাকায় ভীষণ নিস্তব্ধ রাতের বুক চিরে ছুটছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাঁজোয়া গাড়ির বহর। তীব্র হতাশা আর ভয়ে কাঁপছে বাংলাদেশের মানুষ। অবরুদ্ধ ঢাকার একটি পরিবারের কর্তা মতিন সাহেব ট্রানজিস্টার শোনার চেষ্টা করছেন মৃদু ভলিউমে। ভয়েস অব আমেরিকা, বিবিসি, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শোনার চেষ্টা করছেন। নব ঘোরাচ্ছেন ট্রানজিস্টারের। হঠাৎ শুনতে পেলেন বজ্রকণ্ঠের অংশ বিশেষ: 'মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি / রক্ত আরও দিব/ এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম/ এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

কিছুই ভালো লাগে না মতিন সাহেবের বড় মেয়ে রাত্রির। তাদের পরিবারে কয়েকদিন পর হাজির হন মতিন সাহেবের বন্ধুর ছেলে বদি। বদি এবং তার সহযোদ্ধারা একের পর এক অভিযানে সফল হয়। কিন্তু এক এক করে তারা পাকবাহিনীর হাতে বন্দি হয়। একটি অপারেশনে গুলিবিদ্ধ হয় বদি। তাকে মতিন সাহেবের বাড়িতে রেখে ফেরার পথে ধরা পড়ে গেরিলাযোদ্ধা রাশেদুল করিম। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় থু থু ছিটিয়েছেন পাকিস্তানি মেজরের মুখে। হাতের আঙুল কেটে ফেলা হয়েছে তার। তবুও তিনি মাথা নোয়াননি। কার্ফ্যু শুরু হওয়ায় ডাক্তার-ঔষধের জন্য সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তাকে। কিন্তু তিনি কি পারবেন সকাল পর্যন্ত বাঁচতে? তিনি কি আরেকটি ভোরের সূর্যালোক দেখতে পাবেন? জানতে হলে দেখতে হবে চলচ্চিত্রটি।

'আগুনের পরশমণি' সিনেমার চরিত্ররা

সিনেমাটিতে বিপাশা হায়াত-রাত্রি, আসাদুজ্জামান নূর-বদিউল আলম, আবুল হায়াত-মতিন, ডলি জহুর-সুরমা, শিলা আহমেদ-অপলা, দিলারা জামান-বদি'র মা, মোজাম্মেল হোসেন-বদির মামা, সালেহ আহমেদ-চায়ের দোকানদার, হোসনে আরা পুতুল-বিন্দি, ফজলুল কবীর তুহিন-রাশেদুল করিম, লুৎফর রহমান জর্জ-জর্জ চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

'আগুনের পরশমণি' নিয়ে ঘটন-অঘটন

হুমায়ূন আহমেদের প্রথম সিনেমা 'আগুনের পরশমণি'র প্রতিটি ধাপই বিচিত্র, গল্পে ভরপুর। এই সিনেমায় কীভাবে অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচন করেছিলেন পরিচালক? চলুন জেনে আসি সেসব গল্প।

রাত্রি-বিপাশা হায়াত: রাত্রি রূপবতী, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। ফলে রাতদিন ঘরেই কাটাতে হচ্ছে রাত্রিকে। স্বপ্নচারী এই মেয়েটির চরিত্রে বিপাশা হায়াতকেই পছন্দ ছিল হুমায়ূন আহমেদের। কিন্তু তাকে নেওয়ার কথা ভাবতেই বেশকিছু প্রতিবন্ধকতা এলো। ছবিতে রাত্রির সংলাপ বেশি নেই, অভিব্যক্তিই সব কথা বলে দেয়। বিপাশা হায়াত তখন টিভি নাটকের ব্যস্ত তারকা। সংলাপ প্রধান কাজ করেই অভ্যস্ত। তাই বাধা এলো, 'নাটকের জন্য তা ঠিক আছে। চলচ্চিত্রের জন্য একেবারেই মানানসই নয়। চলচ্চিত্রে কথা বলতে হবে চোখেমুখে। তাছাড়া মেয়েটির গলার স্বর মিষ্টি নয়। একটু খসখসে, চোখের মণিও কালো নয়, খানিকটা বাদামি। বড়পর্দায় যখন চোখ দেখা যাবে তখন সেই বাদামি চোখ মায়াটা তৈরি করতে পারবে না।' হুমায়ূন আহমেদ কারও কথা শুনলেন না। বিপাশাকেই নিলেন। কারণ একটাই, 'আগুনের পরশমণি' বিপাশার খুব প্রিয় উপন্যাসের একটি। আর এই তথ্য হুমায়ূন আহমেদ জানতেন। পরবর্তীতে ছবিতে বিপাশার অভিনয় দেখে, হুমায়ূন আহমেদের মা আয়েশা ফয়েজ নিজের হাতে উলের ব্যাগ বানিয়ে উপহার দিয়েছিলেন। আর বিপাশা পেয়েছিলেন ১৯৯৪ সালের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র অভিনেত্রীর পুরস্কার।

বদিউল আলম-আসাদুজ্জামান নূর: আসাদুজ্জামান নুর ছিলেন হুমায়ূন আহমেদের প্রিয় অভিনেতা। চলচ্চিত্রের বদিউল আলম চরিত্রে তাকেই নিলেন হুমায়ূন আহমেদ। কিন্তু বয়স মিললো না। গল্পে চরিত্রটি টগবগে তরুণ, আর আসাদুজ্জামান নূরের বয়স তখন পঞ্চাশ প্রায়। চেহারায় বয়সের ছাপ পড়ে গেছে, মাথার চুলও কমেছে।

স্বাভাবিকভাবেই তাই প্রশ্ন এলো, পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সের একজন মানুষ তেইশ বছরের যুবকের অভিনয় কীভাবে করবে? হুমায়ূন আহমেদের উত্তর ছিলো, 'পারবে। নূর হচ্ছে নূর। বাজারে বিকল্প ট্যাক্সি পাওয়া যায়। বিকল্প নূর কোথায় পাবো?'

রাত্রির বাবা-মা - আবুল হায়াত ও ডলি জহুর: এ দু'টো চরিত্র নিয়ে হুমায়ূন আহমেদের অতৃপ্তি ছিল। যে ধরনের অভিনয় আশা করেছিলেন, সেটা পাননি। তবে হুমায়ূন আহমেদ তার দায়ভার নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন, 'সমস্যাটা তাদের নয়, আমার। আমি অভিনয় আদায় করতে পারিনি। এই দু'জন এতোই শক্তিমান অভিনেতা যে তাদের কাছ থেকে যা চাওয়া হবে তারা তাই দেবেন। আমি চাইতে পারিনি কিংবা নিজে বুঝতে পারিনি ঠিক কি চাইছি।'

অপলা-শীলা: সিনেমায় অপলা হচ্ছে রাত্রির ছোটবোন। হুমায়ূন আহমেদ তার মেয়ে শীলাকেই এ চরিত্রে নিলেন। এ বিষয়ে হুমায়ূন আহমেদ লিখেছেন, 'রাত্রির ছোটবোন পাগলাটে অপলার ভূমিকায় আমি পক্ষপাতমূলক আচরণ করলাম। নিলাম আমার কন্যা শীলাকে। একেই বোধহয় বলে স্বজনপ্রীতি। এই মেয়ে ন্যাচারালিস্টিক অভিনয়ে ওস্তাদ। চোখেমুখে কথা বলে। মনে হয় জন্মসূত্রে সে এই ক্ষমতা নিয়ে এসেছে।' এর আগে শীলা কখনও চলচ্চিত্রে অভিনয় করেনি। কিন্তু সেটা নিয়ে তার মধ্যে কোনো জড়তা ছিলো না। এ ছবিতে অভিনয়ের জন্য শীলা ওই বছর শ্রেষ্ঠ শিশু অভিনেত্রীর জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছিলেন।

বিন্তি-পুতুল: বিন্তি কাজের মেয়ে। এ চরিত্রে পুতুলকে নেওয়ার পেছনে দারুণ একটা গল্প আছে। তখন 'কোথাও কেউ নেই' ধারাবাহিকের জন্য অভিনেত্রী খুঁজছেন হুমায়ূন আহমেদ। ধারাবাহিকটিতে তিনটি চরিত্র আছে, যারা যৌনকর্মী। ওই চরিত্র করবে, এমন তিনজন মেয়ে দরকার। একজন পুতুলকে নিয়ে এলেন, 'এই মেয়েটাকে দিয়ে চলবে? এর নাম পুতুল। গাজীপুরে থাকে।' হুমায়ূন আহমেদ এক ঝলক দেখেই বললেন, 'চলবে।' পুতুল ধারাবাহিকটিতে অভিনয় করলেন। ধারাবাহিকটি শেষও হলো। এর বহুদিন পর গাজীপুরে আবার হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে তার দেখা। 'কবি' নামে একটি তথ্যচিত্র বানাচ্ছিলেন তিনি, পুতুল সেটা দেখতে এসেছেন। হুমায়ূন আহমেদ বললেন, 'এই মেয়ে তুমি কি তোমার চুল কেটে কদমছাঁট করতে রাজি আছো?' ছবিতে অভিনয় করার খবর শুনে পুতুল চুল কাটতে রাজি। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ালো তার এসএসসি পরীক্ষা। হুমায়ূন আহমেদ সান্ত্বনা দিলেন, 'পরীক্ষা অনেক বড় ব্যাপার। তুমি ভালোমতো পরীক্ষা দাও। পরে কোনো এক সময় আমি তোমাকে সুযোগ দেবো।' কিন্তু পুতুল নাছোড়বান্দা, "এসএসসি পরীক্ষা প্রতিবছর একবার করে আসবে, কিন্তু 'আগুনের পরশমণি' তো আর আসবে না।" অনেক অনুরোধের পর হুমায়ূন আহমেদ রাজি হলেন। পুতুলের পরীক্ষার সূচি মাথায় রেখেই ছবির শিডিউল করা হয়েছিল। আর হ্যাঁ, তার চুল কেটে কদমছাট করতে হয়নি। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার তিনিও পেয়েছিলেন। ছবিটি যখন জাপানে প্রদর্শিত হয়, তখন জাপানস্থ ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটির আমন্ত্রণে তিনিও গিয়েছিলেন জাপানে।

পান দোকানদার-সালেহ আহমেদ: চরিত্রটিতে সালেহ আহমেদকে নিয়ে নিশ্চিন্তই ছিলেন হুমায়ূন আহমেদ। হাসিখুশি মানুষ। রসিকতা করেন, রসিকতায় হেসে গড়িয়ে যান। হুমায়ূন আহমেদ জানতেন, তার অংশটি তিনি চমৎকারভাবেই করবেন। তাকে বলেছিলেন একমাস দাড়ি না কাটাতে। অথচ শুটিংয়ের দিন সালেহ আহমেদ আসলেন 'ক্লিন সেভ' হয়ে। খুব রাগ করলেন হুমায়ূন আহমেদ। নকল দাড়ি দিয়ে নানাভাবে চেষ্টা করা হলো। কিন্তু কোনোটিই পছন্দ হলো না তার। শেষ পর্যন্ত দাড়ি ছাড়াই অভিনয় করতে হলো। এ বিষয়ে হুমায়ূন আহমেদ বলছেন, 'তার অভিনয় চমৎকার হওয়া সত্ত্বেও গেটআপের ত্রুটি আমি ভুলতে পারিনি। গলায় বিঁধে থাকা কৈ মাছের কাঁটার মতো এই ত্রুটি আমাকে ক্রমাগত খুঁচিয়েছে।'

পাকিস্তানি কর্নেল-ওয়ালিউল ইসলাম: তিনি নিজেই ছিলেন নৌবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত অফিসার। কর্নেলের ভূমিকায় খুব দারুণ অভিনয় করেছিলেন তিনি। হুমায়ূন আহমেদ বলেছিলেন, 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার তাকে না দেওয়াটা খুব অন্যায় হয়েছে।' এমনকি এটাও বলেছিলেন, 'আমাকে যদি বলা হয় আগুনের পরশমণিতে সবচেয়ে ভালো অভিনয় কে করেছেন? আমি বলবো- ওয়ালিউল ইসলাম ভূঁইয়া। আমার কথায় অনেকেই হয়তো রাগ করবেন, কিন্তু কথাটা সত্যি।'

'আগুনের পরশমণি' সিনেমার সংগীত

আগুনের পরশমণি চলচ্চিত্রের সংগীত পরিচালনা করেছেন সত্য সাহা। গানের কথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হাছন রাজার। গানে কণ্ঠ দিয়েছেন শাম্মী আখতার, মিতা হক।

প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি

১৯তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের আসরে বাজিমাত করেছিলো 'আগুনের পরশমণি' সিনেমাটি। সেই আসরের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসেবে পুরস্কার পায় 'আগুনের পরশমণি'। শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হয়েছিলেন বিপাশা হায়াত। শ্রেষ্ঠ শিশুশিল্পী-শিলা আহমেদ, শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক-সত্য সাহা, শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার-হুমায়ূন আহমেদ, শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা-হুমায়ূন আহমেদ, শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রাহক-মফিজুল হক ও বিশেষ শাখায় শ্রেষ্ঠ শিশুশিল্পী হিসেবে পুরস্কার পায় হোসনে আরা পুতুল।

শাওনের মূল্যায়ন

একবার মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রিয় সিনেমার কথা বলতে গিয়ে নির্মাতা, অভিনেত্রী ও শিল্পী মেহের আফরোজ শাওন এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এরই মধ্যে বেশ কিছু ছবি নির্মাণ হয়েছে। অনেকেই ভালো বানিয়েছেন। তবে আমার প্রিয় মুক্তিযুদ্ধের ছবির তালিকায় বিশেষ করে বলতে চাই হুমায়ূন আহমেদের 'আগুনের পরশমণি'র কথা। আমি নিজে অভিনয় করেছি 'শ্যামল ছায়া'তে। কিন্তু সেখানে যতটা না যুদ্ধ অনুভূত হয়েছে, তার চেয়ে বেশি অনুভূত হয়েছে 'আগুনের পরশমণি'তে। একটা ঘরের মধ্যে, একটা মধ্যবিত্ত পরিবারকে দিয়ে পুরো বাংলাদেশের চিত্রটা তুলে ধরা হয়েছে। এ ছবিতে ছোট ছোট ডিটেইলস ছিল। পৃথিবীর বিখ্যাত অনেক ছবিতেও এমনটা নেই। ছবিতে দোকানদারের একটি চরিত্র আছে। সালেহ আহমেদ অভিনয় করেছেন। দোকানে উনি ইয়াহিয়া খানের একটি ছবি রেখেছেন, প্রতিদিন ওই ছবিটা থুতু দিয়ে পরিষ্কার করেন। এটা একটা মানুষের ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ। আবার ছবিটা রাখতেও বাধ্য হচ্ছেন দোকানে। খুব ভালো লেগেছে ব্যাপারটা। গণকবর দেওয়ার একটা দৃশ্য আছে। সেই দৃশ্যে টিপ টিপ করে বৃষ্টি যেন প্রকৃতির কান্না। রয়েছে গোরখোদকদের গোপনে দোয়া করা। আবার একটা দৃশ্য আছে, দরজায় শব্দ হয়। সবাই আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। দরজা খুলতেই দেখা যায় একটি কুকুর মানুষের রক্ত চেটে খাচ্ছে। এই যে ডিটেইলিং, এই যে প্রতীকী দৃশ্যগুলো, ছবিটাকে এক ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে।'

এক নজরে নির্মাতা হুমায়ূন আহমেদ

হুমায়ূন আহমেদ ১৯৪৮ সালের ১৩ নভেম্বর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার মোহনগঞ্জে তার মাতামহের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা শহীদ ফয়জুর রহমান আহমদ এবং মা আয়েশা ফয়েজ। তার পিতা একজন পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন এবং তিনি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তৎকালীন পিরোজপুর মহকুমার উপ-বিভাগীয় পুলিশ অফিসার (এসডিপিও) হিসেবে কর্তব্যরত অবস্থায় শহীদ হন। বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস শাখায় অসামান্য অবদানের জন্য হুমায়ূন আহমেদ ১৯৮১ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তার অবদানের জন্য ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ সরকার তাকে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা একুশে পদকে ভূষিত করে। তার নির্মিত চলচ্চিত্রগুলো সর্বসাধারণ্যে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। ১৯৯৪-এ তার নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধভিত্তিক আগুনের পরশমণি মুক্তি লাভ করে। চলচ্চিত্রটি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার সহ আটটি পুরস্কার লাভ করে। তার নির্মিত অন্যান্য সমাদৃত চলচ্চিত্রগুলো হলো শ্রাবণ মেঘের দিন (১৯৯৯), দুই দুয়ারী (২০০০), শ্যামল ছায়া (২০০৪) ও ঘেটু পুত্র কমলা (২০১২)। শ্যামল ছায়া ও ঘেটু পুত্র কমলা চলচ্চিত্র দুটি বাংলাদেশ থেকে বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্র বিভাগে অস্কারের জন্য পাঠানো হয়েছিল। এছাড়া ঘেটু পুত্র কমলা চলচ্চিত্র পরিচালনার জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ পরিচালনা বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন।